Government General Degree College, Kalna-I

চৈতন্য যাত্রা

(A journey towards consciousness)

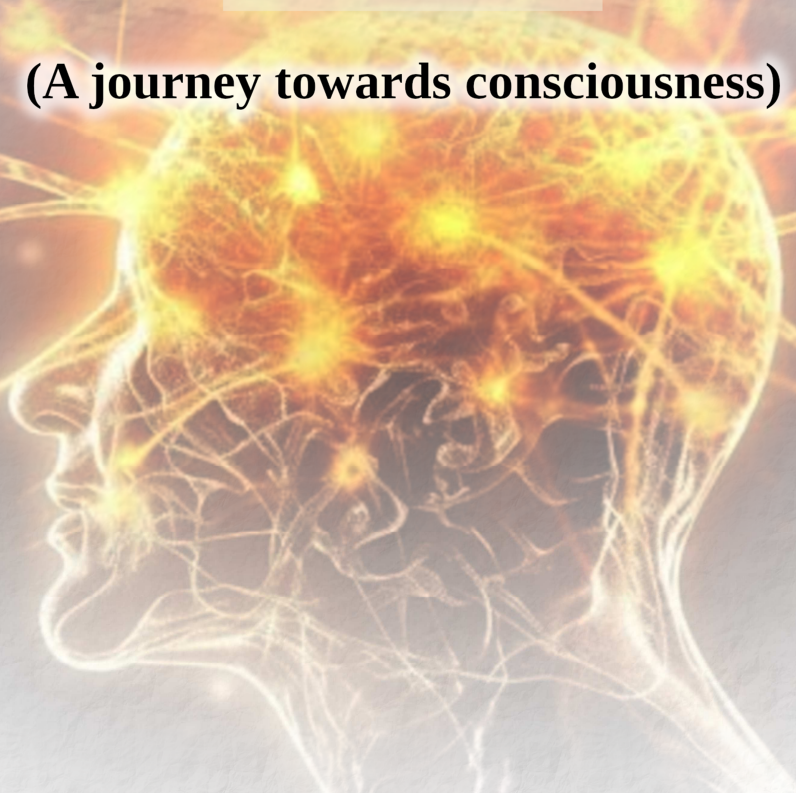

প্রথম বর্ষ
প্রথম সংখ্যা

গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, কালনা-১ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা

চৈতন্য যাত্রা

প্রথম প্রকাশ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, কালনা-১

মুড়াগাছা, মেদগাছি

পূর্ব বর্ধমান

গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, কালনা-১ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা

চৈতন্য যাত্রা

সূচিপত্র

ক্রম	শিরোনাম	লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	**অধ্যক্ষের কলাম**	ড. কৃষ্ণেন্দু দত্ত	শুভেচ্ছাবার্তা	৩-৪
২.	সম্পাদকীয়	ড. বিদ্যুৎকুমার দাস	সম্পাদকীয়	৫
৩.	ব্যক্তির আত্মবিকাশে ভারতীয় দর্শন	ড. প্রিয়াঙ্কা মাইতি (দাস)	প্রবন্ধ	৬-৮
৪.	বারাণস্যাং গঙ্গাতীরে	ড. চিরঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়	কবিতা	৯
৫.	একান্তমনন	ড. কার্তিক মেটে	কবিতা	১০
৬.	পেন্‌সিল স্কেচ	সুশোভন লালা	চিত্র	১১,১৩,১৬
৭.	ছোট্ট একটা ঘটনা	ড. রাখী ভট্টাচার্য	গদ্য	১২-১৩
৮.	নেমেসিস	সৌম্য নাগ	কবিতা	১৪
৯.	মা	রূপক সাঁতরা	কবিতা	১৫
১০.	বিজ্ঞান	মৃত্যুঞ্জয় রায়	কবিতা	১৬
১১.	শব্দজব্দ	ড. শোহিনি ভট্টাচার্য	প্রবন্ধ	**১৭-১৯**
১২.	চৈতন্য, অচৈতন্য ও মনের স্তর বিভাজন : ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের আলোকে	ড. বিদ্যুৎ কুমার দাস	প্রবন্ধ	২০-৩১
১৩.	**আধুনিক সময়ে সংস্কৃত চর্চা ও রবীন্দ্রনাথ: একটি সমীক্ষা**	**ড. শেখ আসরফ আলী**	প্রবন্ধ	৩২-৩৬
১৪.	কালপুরুষ	সুব্রত দাস	কবিতা	৩৭
১৫.	স্থিরচিত্র	**ড. তন্ময় দাস**	স্থিরচিত্র	৩৮

অধ্যক্ষের কলাম

(From the Desk of the Principal)

Greetings to all the stakeholders of the College!

Government General Degree College, Kalna-I is a fledging institute located in the rural belt of Purba Bardhaman district of West Bengal and has started its journey in 2015 under the administrative control of the Department of Higher Education, Govt. of West Bengal. Within a short span of nine years or so, with the coherent attitude and tremendous perseverance of a group of young dedicated, innovative and accomplished faculty members, the institute has grown up rapidly and starves for excellence. The relation between faculty and students has priority in this College that offers 4 years Under Graduate Honours Programmes as well as 3 years Under Graduate Programmes with major in Physical Sciences, Social Sciences and Languages under Curriculum and Credit Framework for Under Graduate Programme as an affiliating college under the University of Burdwan.

The College has robust infrastructural facility namely its *sprawling campus* of 6.72 acres, which is lush-green and clustered around with naturally grown trees exudes peaceful and relaxed environment ideal for teaching learning. With permanent buildings, ground for field and track events, an auditorium, a well-stocked learning center, drinking water facilities, state of the art science laboratories, smart classroom, central computing laboratory, separate common rooms for both boys and girls, uninterrupted power supply facility and many more, the institute strives to pursue nurturing a well educated population, adequately equipped with knowledge and skill which not only helps the economic growth but also in inclusive growth.
The central library has nearly 10,000 books along with web OPAC facility and RFID compliance where students are allowed to lend good number of books for their study. The Library also has 50 seated reading room where students can read books beyond their class hours. Moreover, the Library also possesses a section for job oriented books which helps the students to prepare themselves for various competitive examinations. Apart from that all the departments have their own seminar library where students are allowed to consult with reference books. Within the central library we have an e-corner from where students may get free access to various e-books and e-journals through N-LIST platform to enhance their learning experience. This College being a local chapter of NPTEL Sayam, students are entitled to do online courses on various contemporary topics and to get online certification in a very affordable price.

The College has offered numerous add on courses on basic computing, on communicative & functional English, on value education, on creative writing so as to enhance the employability quotients of our students as well as to inculcate values among our learners so as to make them a responsible global citizen.

Here students are always encouraged to make the best of the many opportunities they have, to learn from the wisdom of our faculties, to work alongside them, to join them in interrogating ideas and to take intellectual risks. This College is a place where free and orderly thinking is cultivated, one where every idea is tested in a crucible of critical reflection. Thus we can assertively promote this College as the best place to begin the thoughtful and arduous process of developing analytical habits of mind, a character of confidence and integrity, and the discipline of respectful engagement with others. The vision of our College is to provide lifelong education which facilitates the academic, creative and professional excellence of our learners by nurturing their innate sensibilities and social values.

The College provides ample opportunities to the students from different streams to mingle together in academic as well as sports, cultural and other co-curricular activities organized through different departments. The spirit of discipline, team spirit, social responsibility towards community development and nation building is inculcated through sports, NSS and other outreach activities.

To achieve and promote creative writing ability of our young learners and faculties the College has taken initiative to launch an Annual College magazine and successfully publish the foundation issue of that College magazine named “Chaitanya Yatra” i.e., “the journey towards consciousness” on the occasion of International Mothers’ Language Day, 21st February, 2024.

I would like to congratulate the students and faculties whose articles are published in this issue of the magazine and simultaneously encourage all the students to contribute their original write-ups for the successive issue of the magazine.
Best wishes for their future endeavours.

Prof.(Dr.) Krishnendu Dutta
Principal

সম্পাদকীয়

মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার চিন্তন-মননে, কখনো বা আচার-আচরণে। পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রত্যন্ত একটি গ্রাম মুড়াগাছা। কালনা-১ ব্লকের এই গ্রামটিতে উচ্চশিক্ষার জন্য যে একটি সরকারি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে – একথা অনেকেই কল্পনা করতে পারেননি। কিন্তু সত্য এই যে, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলো, ২০১৫ সালে শুরু হল তার পথ চলা। আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবারবর্গের ছেলে মেয়েরা এলো উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য। তারা 'চৈতন্য' তথা জ্ঞানের আলোকে স্নাত হতে চায়; মন থেকে'অচৈতন্য' তথা জড়ত্ব বা অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করতে চায়। এই সকল শিক্ষার্থীদের প্রতিভা সকলের সামনে তুলে ধরা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চিন্তন- মননকে এক সুতোই গেঁথে মাল্য রচনার জন্যই প্রকাশিত হচ্ছে গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ,কালনা-১ এর বার্ষিক পত্রিকা – 'চৈতন্য যাত্রা'।

'চৈতন্য যাত্রা' নামের 'চৈতন্য' শব্দটির সঙ্গে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের নাম জড়িয়ে থাকায় এটিকে চৈতন্য সংক্রান্ত পালাগান মনে হতে পারে। কিন্তু ভাবনাটি এমন নয়। এই নামকরণে বহুমুখী ভাবনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নামকরণটি আমাদের কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ প্রফেসর (ড.) কৃষ্ণেন্দু দত্ত মহাশয়ের ভাবনা-প্রসূত। তিনি চান শিক্ষার্থীরা চৈতন্য ভাবনার সঙ্গেও পরিচিত হোক। কারণ ভারত-বর্ষের প্রথম আধুনিক মানুষ হলেন চৈতন্যদেব। কারণ, তিনিই প্রথম জাতি-ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে সব শ্রেণির মানুষকে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। একটি কলেজ ম্যাগাজিন প্রকাশের ভাবনা দীর্ঘদিন থেকেই ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অন্তরে সুপ্ত অবস্থায় ছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সেই ভাবনা আজ ফলপ্রসূ হতে চলেছে। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে পত্রিকা- কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই সকল ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের, যাঁরা পত্রিকা প্রকাশের বিষয়ে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ শ্রদ্ধা এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণী-সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী এবং এই এলাকার বিধায়ক মাননীয় শ্রী স্বপন দেবনাথ মহাশয়কে, যিনি এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের সকল অভিভাবক-দের আগ্রহকে গুরুত্ব দিয়ে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার প্রসারের কথা ভেবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত করে শিক্ষার্থীদের চলার পথকে সুগম করে তুলেছেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে পত্রিকাটি প্রকাশ করার জন্য কিছু ভুল-ত্রুটি হয়তো থেকে যাবে। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই সেই ভুল-ত্রুটি সংশোধনের প্রতিশ্রুতি আমি পত্রিকা কমিটির পক্ষ থেকে দিচ্ছি। পত্রিকাটির মান-মর্যাদা এবং সমৃদ্ধির জন্য সকলের পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

ব্যক্তির আত্মবিকাশে ভারতীয় দর্শন

ড. প্রিয়াঙ্কা মাইতি (দাস)

সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, কালনা-১

ভারতীয় দর্শন শুধু তত্ত্বচর্চা নয় আমাদের দৈনন্দিন জীবনচর্যাও বটে । জীবনকে সুখ সুন্দর করে তাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়াই ভারতীয় নীতির লক্ষ্য । মানুষ প্রকৃতির অতুল সম্পদ ও ঐশ্বর্যকে অস্বীকার করেনি বরং তাকে নানাভাবে গ্রহণ করেছে । স্বভাবতঃই প্রকৃতিজাত লোভ, লালসা, ঈর্ষা আপনা থেকেই জীবনকে ঘিরে ধরেছে । তাছাড়া আত্মরক্ষার তাগিদ থেকে জন্ম নেওয়া সঙ্ঘ-বোধ তাকে গোষ্ঠী-জীবন থেকে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে উন্নীত করেছে । মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজ ও সভ্যতার অনুশাসনও জীবনকে নানা শৃঙ্খলে বেঁধেছে। কিন্তু তাতেও জীবনরক্ষার গ্লানি দূর হয় না । ফলতঃ জীবনধারণের অতিরিক্ত মূল্য খুঁজতে চেয়েছে মানুষ । বহুকাল থেকেই ভারতীয় দর্শন-চর্চায় মানুষের জীবনকে সমুন্নত করার বিভিন্ন প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করি, যার মূলে আছে উচ্চ-আধ্যাত্মিক আদর্শ ।

ভারতীয় নীতিবিদ্যা 'মানুষ'-কে গুরুত্ব দিয়েছে। মানুষ-ই একমাত্র মোক্ষলাভের অধিকারী। তাই ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে মানুষের চরিত্রকে পরিমার্জন করার চেষ্টা করা হয়েছে, যার মধ্যমে মানুষ তার মূল লক্ষ্যে উন্নীত হতে পারে। 'পুরুষার্থ' নামক চতুর্বর্গ পরিকল্পনা যার অন্যতম নিদর্শন। পুরুষার্থ আসলে এক ভিন্ন মাত্রিক উচ্চতায় নিজেকে খুঁজে পাওয়ার নাম, একে আত্মাবিষ্কারও বলা যেতে পারে। ব্যুৎপত্তিগতভাবে মানুষ যা প্রার্থনা করে, যেখানে বা যে বিষয়ে মানুষের প্রীতি নিহিত থাকে, তার কামনাই পুরুষার্থ । প্রচলিত ধারণা অনুসারে পুরুষার্থ চার প্রকার - ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ।

ধর্ম

পুরুষার্থসমূহের মধ্যে ধর্ম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । ভারতীয় শাস্ত্রে 'ধর্ম' শব্দের অর্থ অনুসন্ধান করা হয়েছে । 'ধৃ' ধাতুর সঙ্গে 'মন্' প্রত্যয় যোগ করে # ধর্ম' নিষ্পন্ন করা হয়েছে । 'ধৃ' ধাতুর অর্থ ধারণ করা । 'যা সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করে আছে, তাই ধর্ম (ধর্ম বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা) ।

মহাভারতের ধর্ম বলতে কিছু সদাচার বা সুনীতি পালনকে বোঝানো হয়েছে । মীমাংসা মতে, বেদ বাক্যের দ্বারা জ্ঞাপিত কর্মই ধর্ম (চোদনা লক্ষণোহর্থ ধর্মঃ) । মনু সর্বপ্রথম ধর্মকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন - সামান্য ধর্ম ও বিশেষ ধর্ম । সাধারণ ধর্ম সামাজিক অবস্থান নিরপেক্ষভাবে সকল মানুষের আচরণীয় । সাধারণ ধর্ম প্রসঙ্গে মনু বলেছেন ধৃতি (ধারণ বা ধৈর্য), ক্ষমা, দম (সৎ আচরণ) অস্তেয় (চুরি না করা), শৌচ (দেহ মনের শুচিতা), ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ), ধী (শাস্ত্রজ্ঞান), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য ও অক্রোধ এই দশটি ধর্মের লক্ষণ ।

বিশেষ বিশেষ মানুষের স্বভাব, সামজিক অবস্থান এবং জীবনের নানা পর্যায় ভেদে বিশেষ ধর্মগুলি নির্দিষ্ট করা হয় । এই বিশেষ ধর্মগুলি দুই প্রকার। ক) **বর্ণধর্ম** - বিভিন্ন বর্ণের উপযোগী, ধর্ম । খ) **আশ্রমধর্ম** - বিভিন্ন আশ্রমের উপযোগী ধর্ম ।

ক) বর্ণধর্ম - মানব প্রকৃতির বৈষম্য অনুসারেই বর্ণ-বিভাজন করা হয়েছে । সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-এই তিনটি গুণের বৈষম্য অনুসারে মানবজাতি চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে । গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুন ও কর্মের বিভাগ অনুযায়ী **ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র**-এই চারটি বর্ণের সৃষ্টি করেছেন - ''চাতুর্বণ্যং ময়া সৃষ্ট্যাং গুণকর্মবিভাগশঃ''। **ব্রাহ্মণ সত্ত্বপ্রধান** -যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যাপনা, ব্রাহ্মণদের পালনীয় ধর্ম । **ক্ষত্রিয় রজঃগুণপ্রধান** প্রজাপালন, অসাধু-নিগ্রহ, যুদ্ধযাত্রা ক্ষত্রিয়দের পালনীয় ধর্ম **বৈশ্যগন রজঃ ও তমঃপ্রধান** -বাণিজ্য, কৃষিকর্ম, পশুপালন বৈশ্যের পালনীয় কর্ম । **শুদ্রবর্ণের মানুষ তমঃপ্রধান** -অন্য বর্ণভুক্ত মানুষের সেবা ও পরিচর্যা তাদের পালনীয় কর্ম । বিভিন্ন বর্ণের যে সমস্ত কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলির সামাজিক মূল্য অপরিসীম । মানুষ তার নিজস্ব বর্ণনিষ্ঠ কর্ম দ্বারাই সমাজকে সমৃদ্ধ করতে পারে । স্বধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা । স্বধর্ম মানুষের বর্ণধর্মেরই নামান্তর ।

খ) **আশ্রমধর্ম -** আশ্রম শব্দটি জীবনের এক-একটি অধ্যায়কে বোঝায় । মানুষের সমস্ত জীবনকে চারটি অধ্যায় বিভক্ত করা হয়েছিল - **১) ব্রহ্মচর্য, ২) গার্হস্থ ৩) বাণপ্রস্থ ও ৪) সন্ন্যাস ।**

১) **ব্রহ্মচর্য** - ব্রহ্মচর্যই মানুষের সমগ্র জীবনের ভিত্তি রচনা করে । ব্রহ্মচর্যকে মানুষের শিক্ষালাভের অধ্যায় বলা হয়েছে । আত্মসংযম ও ইন্দ্রিয়সংযমের মধ্য দিয়ে চরিত্র গঠনই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য

২) **গার্হস্থ -** ব্রহ্মচর্যের অবসানে মানুষ গৃহাশ্রমে প্রবেশ করে । সংযত বিবাহিত জীবনযাপনের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে পরবর্তী আশ্রমের জন্য প্রস্তুত করে । গার্হস্থ আশ্রমে মানুষকে নানাবিধ মহাযজ্ঞ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে । যেমন ভুতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ ।

৩) **বাণপ্রস্থ** - গার্হস্থ জীবন সার্থকভাবে সমাপ্ত হলে মানুষ তৃতীয় আশ্রম বাণপ্রস্থে প্রবেশ করে । বাণপ্রস্থের উদ্দেশ্যে চিত্তশুদ্ধি । চিত্তশুদ্ধি হল মানুষ সাধন-মার্গের উচ্চতম দ্বার সন্ন্যাসজীবনে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হয় ।

৪) **সন্ন্যাস** - সন্ন্যাসের মধ্যে দিয়ে বাণপ্রস্থ পূর্ণতা লাভ করে । উপনিষদে বলা হয়েছে যে, যিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করেন, যিনি নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানের মাধ্যমে আত্মজ্ঞানের অনুশীলন করেন, তিনিই সন্ন্যাসী । বস্তুতঃ আলোচ্য তত্ত্ব অনুযায়ী কর্তব্যের ধারণার মূলে আছে অধিকারের ধারণা এবং বর্ণ ও আশ্রমের দ্বারাই মানুষের অধিকার নির্ধারিত হয় ।

অর্থ

ধর্মকে সম্পাদন করার জন্য জাগতিক সামর্থ্যের প্রয়োজন । এই সামর্থ্যকে আমরা 'অর্থ' নামে অ্যভিহিত করি । অর্থ হল দ্বিতীয় পুরুষার্থ । অর্থ স্বতঃ-মূলাবান পদার্থ নয় । অর্থ কেবল উপায়, উপেয় নয় । ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে একথা বলাই হয়েছে যে, প্রয়োজনে, পারিবারিক দায়িত্ব পালনে, সামাজিক কর্তব্য সাধনের জন্য এবং ধর্ম পালনের জন্য 'অর্থ' মানুষের কাম্য-বস্তু । 'অর্থ'-কে পুরুষার্থের অর্ন্তভুক্তি নির্দেশ করে যে, ভারতীয় নীতিশাস্ত্র জীবন-বিমুখ বা বাস্তব-বিমুখ নয় ।

সুতরাং আমাদের পরিমিত ও শাস্ত্রানুমোদিত অর্থ সাধন করা প্রয়োজন । ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যতটা অর্থের প্রয়োজন, ততটাই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত । প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ কামনা করা অপরাধ । ব্যবহারেই অর্থের সার্থকতা । নিজের প্রকৃত প্রয়োজন ও অন্যের উপকারে অর্থ ব্যয় করা উচিত । অর্থের এই সংযত ব্যবহারের জন্য ধর্মের নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক । অর্থ যখন ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তখনই তা পরম-পুরুষার্থ মোক্ষের অভিমুখ নিয়ে যায় ।

কাম

তৃতীয় পুরুষার্থ 'কাম' । বাস্তবমুখী নীতিশাস্ত্রে মানুষের জীবনে, দৈহিক সুখ-সম্ভোগকেও প্রয়োজনীয় বলা হয়েছে এবং কামের পরিচর্যার জন্য, দাম্পত্যরতির জন্য, গৃহস্থ আশ্রমের উল্লেখ করা হয়েছে । কেবল সংযত, সীমিত ও পরিশীলিত কাম-ই মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক বিকাশের জন্যে সমর্থনীয় । মানুষের মনুষ্যত্বের সার্বিক বিকাশের জন্য, মোক্ষলাভের জন্য এই নিম্নসত্তারও লালন ও পরিচর্যা প্রয়োজন । ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে, ভোগের মাধ্যমেই ত্যাগ সম্ভব, পশুপ্রবৃত্তির পরিচর্যার মাধ্যমেই ত্যাগ সম্ভব । শাস্ত্রবিহিত কামই মোক্ষলাভের উপায় হিসাবে পুরুষার্থ ।

মোক্ষ

চতুর্বর্গের অন্তর্গত চারটি পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষকে পরম-পুরুষার্থ বলা হয়েছে । যাকে লাভ করলে আর কিছুই কামনা করার থাকে না, সব প্রয়োজনের আবসান ঘটে, তাই হল পরম-পুরুষার্থ । মানুষকে এই মোক্ষের অভিমুখি করে তোলাই অন্য পুরুষার্থগুলির উদ্দেশ্য । মোক্ষলাভের মধ্যেই ধর্ম, অর্থ, কাম পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করে । একমাত্র মোক্ষই স্বতঃ মূল্যবান।

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে মোক্ষ বা মুক্তিলাভের জন্য মূলতঃ তিনটি পথের উল্লেখ করা হয়েছে । জ্ঞানমার্গ বা জ্ঞানের পথ, কর্মমার্গ বা কর্মের পথ এবং ভক্তিমার্গ বা ভক্তির পথ । এই প্রকার পথনির্দেশ ভারতীয় দার্শনিকদের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরিচায়ক। মনস্তত্ত্বানুসারে মানব মনের প্রধান তিনটি বৃত্ত আছে-জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা বা সংকল্প । যাদের মধ্যে জ্ঞান প্রবল তারা জ্ঞানমার্গী, যাদের মধ্যে অনুভূতিপ্রবল তারা ভক্তিমার্গী ও যাদের মধ্যে ইচ্ছা বা সংকল্প প্রবল তারা কর্মমার্গী । প্রবণতা অনুসারে মার্গ বা পথের ভিন্নতা হলেও লক্ষ্য অভিন্নই থাকে । সকল পথের চরম অভীষ্ট হল মোক্ষ বা মুক্তি ।

ভারতীয় দর্শনে জড়বাদী ও বেদ-বিরোধী চার্বাক ছাড়া ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত প্রভৃতি বৈদিক এবং জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি অ-বৈদিক দর্শনে মোক্ষকেই পরম-পুরুষার্থ বলা হয়েছে ।

পুরুষার্থকেন্দ্রিক ভারতীয় নৈতিক দর্শনের চিন্তন যেন এক আশ্চর্য সুষমতায় মানুষের জীবনকে বেঁধে দিতে চেয়েছে । সেই বন্ধনের মূল কথা হল পরিপূরকতা । প্রত্যেক বর্গ (চতুবর্গ) পরস্পরের পূরক । এরা কখনো বিচ্ছিন্নভাবে থাকে না মিলিতভাবে থাকে । কেননা কোনো বর্গই এককভাবে পূর্ণ নয় । প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ, যা জীবনকে পূর্ণতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায় ।

বারাণস্যাং গঙ্গাতীরে

ড. চিরঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ
অধ্যাপকঃ, সংস্কৃতবিভাগঃ

(অস্তঃ)

সায়ম্ ...
বাসন্তিক পৌর্ণমাসি কৌমুদ্যাম্
উদ্ভাসিতম্ গঙ্গাতীরম্ । ১।
শ্মশানাৎ
আয়াতি শবদেহদাহস্য
তীব্রগন্ধম্ । ২।
ধূমমাশ্রিত্য
সূক্ষ্মশরীরম্ ঊর্ধ্বলোকম্
গচ্ছতি । ৩।
গঙ্গারতিম্
দর্শনার্থং সমবেতা
সমুৎসকাজনতা । ৪।
প্রদীপশিখাপ্রতিবিম্বিতসলিলে
নটরাজস্য নান্দনিকী
শোভা প্রতিভাতি । ৫।
স্বচিত্রপ্রিয়াঃ জনাঃ
অকারণাৎ প্রকাশয়ন্তে
তেষাং 'দন্তরুচিকৌমুদী'। ৬।
আপনিকাঃ
পর্যটকৈঃ সহ উচ্চৈঃ
ভাষন্তে । ৭ ।

(তমিস্রা)

পরন্তু
মম মনসি
সুখং নাস্তি । ৮।
দীর্ঘকালং যাবৎ
সুখাভাবেন নিতরাং
পীড়িত মম হৃদয়ম্। ৯।
আশৈশবাৎ
স্বপ্নে আয়াতি
একা মূর্তি । ১০।
দীর্ঘকুন্তলা চারুদর্শনা
হরিণনয়না তস্যাঃ
ওষ্ঠাধরয়োঃ নিবসতি মন্মথঃ। ১১।
কুত্র সা প্রিয়দর্শনী ?
মম হৃদয়াহ্লাদকারিণী
মম প্রাণপ্রিয়া । ১২।
চকিত হরিণী ইব
স্বপ্নে সা আয়াতি
নিত্যম্ । ১৩।
হৃদয়ম্ বিদার্য
কুহেলিকা ইব
সা কুত্র গচ্ছতি ? ১৪।

(উদয়ঃ)

তাম্ বিনা কুতঃ জীবনম্ !
সলিলসমাধিনা
প্রাণান্ ত্যজামি । ১৫।
গচ্ছতাকালেন
কয়াচিৎ নীলাম্বর্যা
বিপরীতং সংঘর্ষং জাতম্ । ১৬।
চকিতনয়না সা
পুনর্দর্শনায় উন্মোচয়তি
হরিণীব চক্ষুদ্বয়ম্ । ১৭ ।
মম হৃদয়ে জায়তে
অনির্বচনীয়ম্
আনন্দ ফল্গুধারা । ১৮ ।
অনিমেষনয়নে তাম্
পশ্যামি ত্বয়াপি দরীদৃশ্যতে
মম মুখম্ । ১৯ ।
কা ত্বম্ ?
'অন্নপূর্ণা' অহম্। ত্বম্ ?
'সদাশিবঃ' । ২০ ।
হস্তস্পর্শমাত্রনৈব চলচিত্রবৎ
মম মানসপটলে উদ্ভাষিতাঃ
ভবন্তি পূর্বজন্মনঃ সুখস্মৃতয়ঃ । ২১।

একান্তমনন

ড. কার্তিক মেটে

সহ. অধ্যাপক

সংস্কৃত বিভাগ

।

একান্তবাসে উদাসীনতা গ্রাস করে

মনের গোপন দ্বার গুলো খুলে দেয়।

অভিজ্ঞতারা কত কথাই না বলে,

সফলতারা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যায়।

ব্যর্থতারা চারু-চটুল টিপ্পনী কাটলে,

জীবনীশক্তি জানান দেয় – ওহে ! মা ভৈঃ !

আমি প্রাণপণে বেঁচে আছি।

অন্তর্যামী সাক্ষী মাধব এসে

স্মরণ করিয়ে বলে – স্বভাবস্তু প্রবর্ততে,

অথ কর্তব্যং কর্ম সমাচার।

পেন্‌সিল স্কেচ : কাঠঠোক্‌রা পাখি

সুশোভন লালা, সহকারী অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ

ছোট্ট একটা ঘটনা

ড. রাখী ভট্টাচার্য
সহকারী অধ্যাপিকা
শিক্ষা বিভাগ

প্রায় পাঁচ বছর আগের এমনই কোনো বসন্তের সময়। না, বসন্ত ঋতুর মহীমা প্রচারের জন্য এ লেখা নয়। বরং আপনি কি লক্ষ করেছেন, বসন্ত মানেই পরীক্ষার তোড়জোড় ! কি উল্টো পুরান বলুন দেখি!

যাগ্গে.....

সেই দিনও ক্লাসরুমে ক্লাসরুমে পরীক্ষা চলছে। পড়ন্ত বিকেল। আমার আবার পরীক্ষার ডিউটি দিতে মন্দ লাগে না। কত রকমের যে ছাত্রছাত্রী আসে। দুষ্টু, শান্ত, কথার ফুলঝুরি, অতিবাধ্য, চরম অবাধ্য। আর কয়েকজন যারা আছে যে জানান দেয়না। তেমনই একজন জানলার ধারে কোনা করে বসে। লিখছে না বিশেষ, ভাবছে , দেখছে। নিজের জগতে মশগুল। মাঝে মাঝে পেন হাতে কিছু করছে বটে। বেশ কিছুক্ষন পাশে দাঁড়াতে নিজেই চোখ তুলে চেয়ে বললো - দেখুন তো ম্যাম, ভালো হলো কিনা? আমি ওর হাত থেকে নিয়ে দেখি , এত প্রশ্নপত্র! প্রায় বকতে যাচ্ছিলাম, জানো না কশ্চেন পেপারে লিখতে নেই!

কিন্তু কোনো উত্তর নয়, ওর কারসাজিতে পুরো প্রশ্ন পত্র ভোল বদলে গ্রিটিংস কার্ড হয়ে গেছে। অদ্ভুত তার নতুনত্ব আর নিখুঁত ডিজাইন।

হেসে বললাম, হ্যাঁ রে, তোকে বুঝি কেউ বলেছিল আঁকায় ভালো হলে জুলোজি পড়া যায় !

সে বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল, শেষ পাতাটা তো দেখলেনই না।

ভুল শুধরে পাতা উল্টে নিয়ে দেখি শেষের পাতা প্রায় ফাঁকা পেয়ে কল্পনার তুলিতে মনের সব রঙ ঢেলে দিয়েছে।

আমি হতবাক হয়েই বললাম তুই তো সত্যি সত্যি শিল্পী মানুষ রে। তা হ্যাঁ রে বাবা, পাস করবি তো ! আর ভঙ্গি টঙ্গী নয়, নিখাদ বিরক্তিতে প্রশ্নপত্র খানা হাত থেকে নিল। এমন অপূর্ব শিল্প কর্মের পরে এমন প্রশ্ন ! তার হতাশায় মনে হলো পরীক্ষায় আমিই ফেল করেছি। তাড়াতাড়ি বললাম, বড়ো ভালো এঁকেছিস রে। এগাল থেকে ওগাল হেসে বলল - আপনার ভালো লেগেছে? তাহলে এটা রেখে দাও।

কি পরিচয় এই প্রশ্নপত্রের ! এক ব্যর্থ সিস্টেমের প্রতীক ! নাকি অযোগ্য ছাত্রের ব্যার্থ প্রয়াস ! তর্ক তো জরুরি। কিন্তু তারও চেয়ে জরুরি সেই মানুষটা। যে নিজের সৃষ্টি দিয়ে অমলিন হাসি উপহার দিতে পারে। ওই হাসিতে ফেল করা টিচারের সব ভুল মাফ

পেন্‌সিল স্কেচ : পাখি

সুশোভন লালা, সহকারী অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ

নেমেসিস

সৌম্য নাগ
প্রথম সেমেস্টার,
ইতিহাস বিভাগ

স্বর্গ যখন এক কলঙ্কিত অধ্যায় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত
মর্ত্য তখন দীর্ঘ ঘুমে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে
পাতাল তখন ব্যাস কে নিয়ে নিষ্ঠুরের মন্ত্র লিখতে ব্যস্ত
জন্ম হলো অবাধ ক্ষিপ্ত শিশুর।।
সে পরিচিতি হীন এক সুন্দর নরদেব
যার রক্তাক্ত কলজে আজও নিঃস্ফলক
বক্ষ যার রুদ্র ভৈরব
কপালে কাটা তারে মোড়া
যা কারণে অকারণে তাণ্ডব নৃত্য করতে পারে।
যে কাল ভৈরব হয়ে মানবতা ধ্বংস করতে পারে।
আবার নেমেসিস হয়ে সবকিছু ঠিক করতে পারে
হ্যাঁ আমি তার বংশধর।।
নরক যখন মৃত্যুর সাথে পাশা খেলায় মত্ত
আতঙ্কবাদীরা যখন শয়তানের দান ফেলে
আর জানোয়ার মানুষেরা মদ্যপ চিন্তায়
নারীদের পরিধান থেকে বক্ষ যুগল ছিঁড়তে মত্ত
সেই কান্না থেকে উঠে আসা এক জীর্ণ শব্দে
যৌনতা নেমেসিস কে ডেকে যায়
নিজেকে রক্ষার তাগিদে
ওই বংশধর আমি।
হ্যাঁ আমি সেই নিষ্ঠুর বর্বরতার দানব নেমেসিস।।

মা

রূপক সাঁতরা
পঞ্চম সেমেস্টার

সব যন্ত্রণার প্রথম ঔষধ 'মা'।
মা মানে বেঁচে থাকার দ্বিতীয় অক্সিজেন
আমার চোখে দেখা সবচেয়ে সুন্দরী
নারী হলেন আমার মা।
নিজে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও রক্ষা করেন সন্তানের প্রাণ
সব মেয়েরা ত্যাগী হয় না, কিন্তু মা সবসময়
ত্যাগ করেন, কখনও স্বামী, কখনও সংসারের জন্য
আবার কখনও সন্তানের জন্য
কিছু প্রাণ উৎকণ্ঠায় থাকে, তাই মা হওয়া
এত সহজ নয়।
পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী কে ?
কার চোখে জল ?
মা-বাবার জন্যই এই জীবন ও সুখ ও আনন্দের চোখে জল।

মোদের গরব, মোদের আশা,
আ!মরি বাংলা ভাষা-
তোমার কোলে,
তোমার বোলে,
কতই শান্তি ভালোবাসা!

অতুলপ্রসাদ সেন

বিজ্ঞান

মৃত্যুঞ্জয় রায়
প্রথম সেমেস্টার,
বাংলা বিভাগ

পৃথিবী আমার কাছে
থাকে নতজানু
বিজ্ঞান! বিজ্ঞান! চাই
পরয়াণু।
আরও আরও সামগ্রী ভোগ
যাতে করে যেতে পারি
গড় আয়ু বাড়িয়ে দাও বিজ্ঞান
তাড়াতাড়ি।
এই গ্রহ গিলে ফেলে
দেব পিটটান
নতুন গ্রহের খোঁজ করো
বিজ্ঞান।
শিকারী কুকুরের গ্রাণ নিয়ে
বিজ্ঞান নড়েচড়ে,
মনিবের নির্দেশে আজকাল
সে খরগোশ ধরে।

পেন্‌সিল স্কেচ : খরগোশ

সুশোভন লালা, সহকারী অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ

শব্দজব্দ

ড. শোহিনি ভট্টাচার্য,

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ভাষা আসলে বহতা নদীর মতো। তাই ভাষার শব্দার্থও চিরকাল এক খাতে বয় না। আমাদের মুখে মুখেই তা বাঁকবদল করে; এভাবেই আরও গতিশীল হয়ে ওঠে মৌখিক ভাষা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, **মৃগ** শব্দের অর্থ এখন দাঁড়িয়েছে হরিণ, কিন্তু পুরাকালে তা ছিল না। যেকোনো পশুই ছিল মৃগ; **মৃগয়া**তে গিয়ে রাজারা তো শুধু হরিণ শিকার করতেন না! **মৃগেন্দ্র** অর্থে পশুরাজ সিংহকে বোঝাত। মেঘনাদবধ কাব্যেও দেখা যায় বিভীষণকে মেঘনাদ পশুরাজ অর্থে **মৃগেন্দ্রকেশরী** বলে সম্বোধন করেছেন অথবা খেয়াল করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের **কালমৃগয়া** নামকরণটি। তাছাড়া, বানরের সংস্কৃত রূপ হিসেবে আমরা পাই **শাখামৃগ** শব্দটি। এইধরনের কিছু শব্দের অর্থান্তর নিয়েই আমাদের এই আলোচনার সূত্রপাত করা যাক।

সূত্রপাত-এর প্রকৃত অর্থ হলো সূত্রস্থাপন করা। সূত্রধর বা ছুতোর মিস্ত্রিরা কোনও কিছু তৈরি করার আগে, কালি-লেপা সুতো কাঠের ওপর ফেলে রেখা টেনে নেন। রাজমিস্ত্রিরাও বাড়ি তৈরির আগে ভিতের(ভিত্তি) Lay out করে নেন দড়িতে চুন দিয়ে। অর্থাৎ কোনো কাজ শুরু করার প্রথম দশাই হলো সূত্রপাত। ভূমিকা, নান্দীমুখ, প্রাককথন প্রভৃতি শব্দগুলি এর প্রতিশব্দ হিসেবে বিবেচিত হয়।

এবার আসি, **টানা-পোড়েন** শব্দবন্ধে। কাপড় বোনার আগে তাঁতশিল্পীরা কাপড়ের লম্বা দিকের সুতোগুলো প্রথমে সাজিয়ে নেন; এগুলিকে বলা হয় টানা। আর মাকু দিয়ে তাঁতযন্ত্রের প্রস্থের দিকে যে সুতোগুলো ভরা হয়; সেগুলিকে বলা হয় পোড়েন(সং- পরিমাণ) অর্থাৎ টানা এবং পোড়েন-এর অভিমুখ ভিন্ন ভিন্ন দিকে। তাই কোনো মানুষ যখন দ্বন্দ্ব বা উভয়মুখী সমস্যায় পড়ে, তার সেই অবস্থাকে বলা হয় টানা-পোড়েন।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সর্বদা কোনো কাজে হাত দেওয়ার আগে **আটঘাট** বেঁধে ফেলেন আমরা বলে থাকি, যাতে কাজে নেমে কোনও সমস্যায় না পড়তে হয়। তবে এই ঘাট কোনও নদী বা পুকুরের ঘাট নয়; এর উৎপত্তি হয়েছে তবলার ঘাট থেকে। তবলার কালোরঙের গাবের চারপাশের বৃত্তাকার স্বর যখনই এক কম্পাঙ্কে মিলে যায়, তখনই তবলাটি বাঁধা শেষ হয়

বা বলা যায় তবলাটি সঙ্গতের উপযুক্ত হয়। এই চারপাশের স্বর মেলাতে গেলে তবলার পরিধি ঘিরে নির্দিষ্ট দূরত্বে যে আটটি ঘাট আছে, সেগুলি হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে এক সুরে বেঁধে নিয়ে প্রস্তুত করতে হয়। একেই বলে আটঘাট বাঁধা। এভাবেই সুরের জগত থেকে এই শব্দটি আমাদের অজান্তেই ক্রমশ দৈনন্দিন জীবনে ঢুকে গেছে।

আবার, **আটপৌরে** শব্দটি এসেছে অষ্টপ্রহর থেকে। তিন ঘণ্টায় এক এক প্রহর হলে, অষ্টপ্রহর-এর মোট সময়কাল হয় ২৪ঘণ্টা অর্থাৎ সমস্ত দিনরাত। সাধারণত, যে কাপড়-জামা আমরা সবসময় পরে থাকি, সেগুলোকেই আটপৌরে বিশেষণ দেওয়া হয়। কিন্তু কেউ কেউ এখন নিপাট ভালোমানুষ বোঝাতেও আটপৌরে শব্দটি ব্যবহার করেন; তাই কেউ কেউ আজকাল হয়ে উঠছেন আটপৌরে-ভদ্রলোক!

সাঙ্গোপাঙ্গ শব্দটির বর্তমান অর্থ সদলবল বা অনুচরবর্গের সঙ্গে উপস্থিত হওয়া বোঝালেও প্রকৃত অর্থ কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম। শব্দটির বিশ্লেষণে দেখা যায়, স+অঙ্গ+উপাঙ্গ (**অঙ্গ** বলতে এখানে শিক্ষা, কল্প প্রভৃতি এবং **উপাঙ্গ** বলতে মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি) বোঝায়। অর্থাৎ সকলপ্রকার অঙ্গ এবং উপাঙ্গকে নিয়েই সাঙ্গোপাঙ্গ। সে যাই হোক, সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতে কে-ই-বা-না ভালোবাসে!

বার্ধক্যজনিত কারণে বুদ্ধিভ্রংশ হওয়াকে **ভীমরতি** বলা হয়। যদিও এর সঙ্গে রতি শব্দের কোনও সংযোগ নেই। এর উৎসে আছে ভীষণ রাত্রি শব্দবন্ধটি। আসলে, সাতাত্তর বছরের সপ্তম মাসের সপ্তম রাত্রিটি খুবই কষ্টকর, একে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। যাঁরা এই বয়সটি পার করেন, তাঁদের অনেকের মধ্যেই বুদ্ধিভ্রংশ হওয়ার বিষয়টি লক্ষ করা যায়। এই থেকেই বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে কথাটির ব্যুৎপত্তি।

শেষ বয়সে **পটলতোলা**-র কথাটিও না বললেই নয়। পটোল একটি উপাদেয় সবজি হলেও, পটলতোলা বিষয়টি মৃত্যুর অনুষঙ্গে সব সময়েই দুঃখের। আসলে, **পটল** আর **পটোল** দুটি শব্দই সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে। কিন্তু অর্থ অনুযায়ী এদের বানান রূপ বদলে গেছে। সবজি অর্থে ট-তে ও-কার দস্তুর, অর্থাৎ বানানটি হবে পটোল (পট্+ওল)। আর দ্বিতীয় পটল (পট্+অল) মানে হলো চোখের ভেতরের সাদা আর গোলাকার কালো অংশ। মানুষ মারা গেলে এই অংশটি ওপরের দিকে উঠে যায়। তাই বাংলা বাগধারায় মৃত্যুকে বলা হয় পটলতোলা।

আর নয়, এবার পাততাড়ি গোটাই। সুযোগ পেলে পরে আবার শব্দকথা আলোচনা করা যাবে। তবে শেষ করার আগে, **পাততাড়ি** শব্দটার কাছে একটু যাই।

পাতার তাড়ি বা আঁটি অর্থেই পাততাড়ি শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কাগজ আবিষ্কারের আগে গাছ-গাছালির উপাদান থেকে তৈরি কালি দিয়ে তালপাতা বা ওই জাতীয় পাতার ওপর পুথি লেখা হতো। ছাত্ররা গুরুগৃহে ওইসব পুথি পাঠ করতো। গুরু যখন পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করতেন, তখন ছাত্ররা প্রথমে তাদের পাতার তাড়ি গুটিয়ে নিতো এবং তারপর নির্দিষ্ট স্থানে চলে যেতো। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ছুটি মানেই পাততাড়ি গোটানো। সেখান থেকেই পাততাড়ি গুটিয়ে নেওয়ার অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে কর্মক্ষেত্র থেকে পলায়ন!

শরীরের পিপাসা ছাড়া আর-এক পিপাসাও মানুষের আছে। সংগীত চিত্র সাহিত্য মানুষের হৃদয়ের সম্বন্ধে সেই পিপাসাকেই জানান দিচ্ছে।

-- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চৈতন্য, অচৈতন্য ও মনের স্তর বিভাজন : ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের আলোকে

বিদ্যুৎ কুমার দাস
সহযোগী অধ্যাপক ,বাংলা বিভাগ

" তোমার চৈতন্য হোক " – এই আশীর্বাদ বহশ্রুত, মহাপুরুষেরা আশীর্বাদপ্রার্থী ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে একথা বলে থাকেন। এর অর্থ – মন থেকে অচৈতন্য বা অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হোক; জগৎ জীবনের কল্যাণ সাধিত হয় এমন শুভ চেতনার উদয় হোক। 'অচৈতন্য'-কে বলা যায় মনের অন্ধকার দিক, আর 'চৈতন্য' – মানব মনের আলোকিত দিক। আধুনিক যুগ হল বিজ্ঞানের যুগ, যুক্তি-বুদ্ধির যুগ। মানব-মনের রহস্যময় ,জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিও আধুনিক যুগের। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মানব মনের এই জটিল রহস্যময় দিক এবং আলোচ্য 'চৈতন্য', 'অচৈতন্যে'র বিষয়টি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন।

উনিশ শতকে মনস্তত্ত্বের প্রভাব বা প্রসার তেমন ছিল না, বিশ শতকের সূচনায় মনো-বিজ্ঞানী সিগমন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud)-এর 'The Interpretation of Dreams' (১৯০০খ্রিঃ) ও 'Psycho-pathology of Everyday life' (১৯০৪ খ্রিঃ) প্রকাশিত হলে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাজগতে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তাঁরা মানব-মনের গোপন রাজ্য সম্পর্কে আগ্রহী হন। এরপর আমরা দেখি, ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর গহন-মনের গভীর রাজ্যের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। এর ফলে উপন্যাস মানব স্বীকৃতি থেকে বিবর্তিত হয়ে মানব-মনের স্বীকৃতির স্তরে পৌঁছায়। প্রাধান্য পায় মানুষের গোপন-মন অর্থাৎ নির্জ্ঞান মনের বিশ্লেষণ ও বর্ণনা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, 'মনস্তত্ত্ব' বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠার পূর্বে বা ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব আবিষ্কারের আগে নির্জ্ঞান বা অচেতন মন সম্বন্ধে মানুষের কোনো ধারণাই ছিল না, এমনটি নয়। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ের নয়, সুতরাং ফ্রয়েড মানব মনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই ব্যাখ্যাকে সামনে রেখে তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি। তাই বঙ্কিম সাহিত্যে আমরা মনের নির্জ্ঞা প্রদেশের কথা অন্যভাবে ব্যক্ত হতে দেখি। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যেও মনের চেতন স্তর ছাড়া অন্য স্তরগুলিরও ইঙ্গিত রয়েছে।

মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে আমরা দেখি, শকুন্তলা কুটীরে উপস্থিত।কিন্তু সেখানে অতিথি দুর্বাসা মুনি এসে উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে উপযুক্ত সম্বর্ধনা জানাননি। এর কারণ কী? কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে শকুন্তলার সখী প্রিয়ংবদা অনুসূয়াকে বলেছে- প্রিয়ংবদাঃ ননু উটজে সন্নিহিতা শকুন্তলা।

(আত্মগতম্) আম্, অদ্য পুনঃ হৃদয়েন অসন্নিহিতা।" অর্থাৎ 'কুটীরের কাছেই শকুন্তলা আছে। (স্বগতঃ) কিন্তু মন তো তার নিজের মধ্যে নেই।'- প্রিয়ংবদার এই উক্তিটিতে আজ একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের মানসপটে শকুন্তলার অবচেতন বা প্রাক্-চেতন মনের (Pre-Conscious mind- এর) কথাই ভেসে ওঠে, যেখানে সদ্য বিগত চিন্তাভাবনা, স্মৃতি ও নিরুদ্ধ আবেগ সঞ্চিত থাকে। প্রিয়ংবদা ঐ অবচেতন মনের কথাই বলেছিল। শুধু তাই নয়, শকুন্তলা 'দিবা স্বপ্নে' মগ্ন থাকার জন্যই (রাজা দুষ্মন্তকে কেন্দ্র করে) যে, কুটীরে ঋষি দুর্বাসার উপস্থিতি টের পান নি- একথাও আমরা বলতে পারি।

এই নাটকেরই পঞ্চম অঙ্কে দেখা যায়, রানী হংসপদিকার গান শুনে রাজা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন এবং তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন-

"রাজা:- (আত্মগতম) কিং ন খলু গীতার্থমাকর্ণ ইষ্টজন বিরহাদূতেহপি বলবদুৎ কষ্টিতোহস্মি।
অথবা
রম্যানি বীক্ষা মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্ পর্যুৎসুকীভবতি যৎ সুখিতোহপি জন্মঃ। তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং ভাবস্থিরাণি জুননান্তর -সৌহৃদানি।" অর্থাৎ "রাজা: (স্বগতঃ) কোন ইষ্টজনের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটে নাই, তথাপি এই গান শুনিয়া আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।" অথবা "সর্বপ্রকারে সুখী হইয়াও

কোন সুন্দর বস্তু দেখিয়া বা মধুর শব্দ শুনিয়া মানুষ কেন আকুল হয়? কারণ তাহার মনের মধ্যে বদ্ধমূল কোন জন্মান্তরীণ স্মৃতি অজ্ঞাতসারে তাহার মনে জাগিয়া উঠে। – এখানে 'বদ্ধমূল জন্মান্তরীণ স্মৃতি' মানুষের চেতনায় বা চেতন মনে থাকা কোনো স্মৃতির ইঙ্গিত করছে না; তা মনের নির্জ্ঞান প্রদেশের সুপ্ত স্মৃতি ও চিন্তা ভাবনার ইঙ্গিত বহন করছে। শুধু কালিদাসের সাহিত্যেই নয়, একটু অনুসন্ধান করলে ফ্রয়েড পূর্ববর্তী যুগের আরো অনেক সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্রের মধ্যেও চেতনোর্ধ্ব মন সম্পর্কে মানুষের অস্পষ্ট ধারণার পরিচয় পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র 'কর্মযোগ' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৬ নং শ্লোকের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই শ্লোকে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন- "অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ। অনিচ্ছন্নপি বাষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিত:।।"
অর্থাৎ "হে কৃষ্ণ, তা হলে মানুষ স্বেচ্ছায় না করলেও যেন বলপূর্বক কার দ্বারা নিয়োজিত হয়ে পাপাচরণ করে?"

– এখানে বলা হচ্ছে, স্বেচ্ছায় অর্থাৎ চেতন মনের ইচ্ছায় পাপাচরণ করতে না চাইলেও মানুষ কখনো কখনো তা করতে বাধ্য হয়। এই বাধ্যবাধকতার মধ্যেই আমরা চেতন মনের

নিয়ন্ত্রক অন্য কোনো মনের ইঙ্গিত পেয়ে যাই। সেই মন অচেতন মন যা অদৃশ্যে থেকেই ব্যক্তির সচেতন আচরণকে প্রভাবিত করে। মনের এই স্তরটি সম্বন্ধে প্রাচীন ও মধ্যযুগের মানুষের কোনো তাত্ত্বিক ধারণা না থাকায় তাঁরা নিজেদের অজ্ঞাতেই আকারে ইঙ্গিতে ঐ চেতনোর্ধ্ব মনোরাজ্যের আভাস দিয়েছেন।

ফ্রয়েড মানব-মন সম্পর্কে সুদীর্ঘ গবেষণা করার পর জানান যে, মানুষ তার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আদিম যৌন কামনা-বাসনা ও জিঘাংসার অবদমন (repression) আর উত্তরোত্তর উদ্বর্তন (Sublimation) ঘটিয়ে মানব সভ্যতার প্রগতির রথকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, বিকাশ ঘটেছে শিল্প-সাহিত্য- সংস্কৃতির। কিন্তু কামনা-বাসনাকে অবদমিত (repressed) করার একটা মূল্য মানুষকে দিতে হয়েছে। অবদমিত কামনা-বাসনা স্বপ্ন-দৃশ্য হয়ে ব্যক্তির জীবনে ফিরে এসেছে। কখনো কখনো স্বপ্নই হয়ে উঠেছে মানুষের স্নায়ুরোগের অন্যতম উপসর্গ। তাই স্নায়ুরোগের স্বরূপ জানার জন্য 'স্বপ্নতত্ত্ব' সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। আবার নির্জ্ঞান মন বা অবদমন ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে স্বপ্নতত্ত্ব বা মানুষের বিভিন্ন ধরনের অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণের স্বরূপ উপলব্ধি করা অসম্ভব। ফ্রয়েডের মতে "রোগলক্ষণ, স্বপ্ন, ঠাট্টা-তামাশা, ভুলে যাওয়া প্রভৃতি কোন মানসিক ঘটনাই আকস্মিক নয়। প্রত্যেকটি মানসিক ঘটনার পেছনে এমন কোনো কারণ বিদ্যমান থাকে যা ঐসব ঘটনার জন্ম দেয়। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে কোনো মানসিক ঘটনার মানসিক কারণ সজ্ঞানে খুঁজে পাওয়া না গেলে, তাকে- আকস্মিক বলে মনে করা ঠিক নয়। কারণ যদি সজ্ঞান মনে না থাকে, তাহলে নির্জ্ঞান মনে থাকবে, বর্তমান বয়সের ঘটনাবলীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া না গেলে শৈশবের ঘটনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। পার্থক্য শুধু এই যে, মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে শৈশবের অবদমিত ইচ্ছা, কামনা-বাসনা খুঁজে বের করে আনলে, তবেই ঐ কারণের সন্ধান পাওয়া যাবে।"[১]

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কিছু সাহিত্যে চেতন-অবচেতন ও নির্জ্ঞান মনের ইঙ্গিত থাকলেও মন বলতে শুধুমাত্র মনের উপরিস্তর (Surface mind)- কেই বোঝানো হত; মনের এই চেতন অংশটি বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই অংশেই মানুষের সুখ-দুঃখের চিন্তা, অনুভূতি, আবেগ ও ইচ্ছার বহুবিধ রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। চেতন মনের দ্বারাই আমরা জগৎকে জানি এবং দেখি। বাইরের জগৎ-এর বিভিন্ন উদ্দীপক দ্বারা আমরা যেমন প্রভাবিত হই, তেমনি চেতন মনের দ্বারাই বাইরের জগৎ এর উপর প্রভাব বিস্তার করি। ফ্রয়েড (১৮৫৬খ্রি.-১৯৩৯খ্রি.) ঘোষণা করেন– মনের চেতন অংশটি মনের খন্ডাংশ মাত্র; চেতন স্তরের মাধ্যমে মনের সমগ্র রূপেরপরিচয় জানা যায় না। মনঃ সমীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে তিনি বোঝালেন, চেতন- স্তর (Conscious level) ছাড়া মনের আরো দুটি স্তর রয়েছে- প্রাক্-চেতন বা অবচেতন অংশ

(Sub-conscious or pre-conscious level) এবং অচেতন অংশ বা নির্জ্ঞান মন (Unconscious level)। মনকে জলে ভাসমান তুষার স্তূপের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ভাসমান তুষার স্তূপের খুব কম অংশই সাগর জলের ওপরে থাকে, যা আমরা দেখতে পাই; বাকি অংশ থাকে জলের নীচে। তেমনি আমাদের মনের অতি অল্প অংশই সজ্ঞান বা চেতন, বাকি অংশ নির্জ্ঞান বা অচেতন।

অচেতন বা নির্জ্ঞান মন (Unconscious mind) এর অস্তিত্ব স্বীকার না করলে বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগের (যেমন হিস্ট্রিরিয়া, শুচিবায়ু রোগ, বাতুলতা, হীনমন্যতা) বা ব্যক্তির আচার-আচরণের অসঙ্গতির যথার্থ কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না। ফ্রয়েড তাঁর "Psycho-Pathology of Everyday life" গ্রন্থে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ছোটো খাটো অনেক ভুল-ভ্রান্তির ব্যাখ্যা করে মনের নির্জ্ঞান স্তর (Unconscious level) -এর অস্তিত্বের যুক্তি দিয়েছেন।

আমাদের আকস্মিক ভাবে কিছু মনে পড়ে যাওয়া, অগোচর আবেগ, নিদ্রাকালীন মনের ক্রিয়া, অদ্ভূত, উদ্ভট বা অর্থহীন স্বপ্ন প্রভৃতি বিষয়গুলি অবচেতন ও নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্বকেই প্রমাণ করে। উদগতি (Sublimation), অভিক্রান্তি (Displacement), পশ্চাদ্গমন বা প্রত্যাবৃত্তি (Regression) ইত্যাদিকে ফ্রয়েড নির্জ্ঞান ইচ্ছা প্রকাশের উপায় বলে মনে করেন।

অচেতন বা নির্জ্ঞান স্তর (unconscious level) মনের নিষ্ক্রিয় কোনো অংশ নয়। বরং মনের এই তৃতীয় স্তরটিই অত্যন্ত সক্রিয়। 'অচেতন' শব্দটি এখানে 'চেতনাবিহীন' অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। ফ্রয়েডীয় মনঃ সমীক্ষা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে 'unconscious' বা 'অচেতন' কথাটির স্বতন্ত্র একটি অর্থ আছে। চেতন স্তর বহির্ভূত অথচ মনের অন্তর্গত গভীরতম গতিশীল স্তরটিকেই ফ্রয়েড 'নির্জ্ঞান' বলে অভিহিতকরেছেন। তাঁর মতে, নির্জ্ঞান মন অবদমিত কামনা-বাসনার আশ্রয়স্থল। আমাদের অবদমিত বাসনাগুলি মনের নির্জ্ঞান প্রদেশে নির্বাসিত হয়। তবে সেখানে গিয়ে তাঁরা নিষ্ক্রিয় থাকে না, সর্বদাই আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষের জাগ্রত অবস্থায় অসামাজিক কামজ ইচ্ছাগুলি স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। কারণ জাগ্রতকালে ন্যায়-নীতি-পুষ্ট অধিশাস্তা বা Super-ego সর্বদা প্রহরীর মত সজাগ থাকে। তাই নির্জ্ঞানের অবদমিত ইচ্ছাগুলি জাগ্রত অবস্থায় পরোক্ষভাবে দৈনন্দিন জীবনের ভুল- ত্রুটি দিবা-স্বপ্নের মধ্য দিয়ে, কখনো বা মানসিক রোগের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অবদমিত ইচ্ছার ঐ প্রকাশগুলি সর্বদাই ছদ্মবেশ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করে। তাই তাদের ছদ্ম আবরণ উন্মোচন না করে নির্জ্ঞান ইচ্ছার স্বরূপ জানা যায় না। মনঃ সমীক্ষণের দ্বারা নির্জ্ঞান ইচ্ছার অব্যক্ত রূপের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা যায়। নির্জ্ঞান কোনো যুক্তি বুদ্ধি বা ন্যায় নীতি বোধের ধার ধারে না। নিজের

পূরণ করাই তার একমাত্র লক্ষ্য। ফ্রয়েডের মতে নির্জ্ঞান মানসবৃত্তির উৎস দুটি- কিছু মানসবৃত্তি জন্মসূত্রে প্রাপ্ত, কিছু মানসবৃত্তি ইচ্ছার অবদমন জনিত। নিষ্পাপ শিশু ,যারা জটিল জগতের কিছুই জানে না, বোঝে না, তাদের মনেও কামনা পুঞ্জীভূত থাকে। শিশুরা স্বার্থপর, আত্মসুখ পরায়ণ। তারা নিজের সুখের জন্য, মনের নিত্য নতুন সাধ মেটাবার জন্য ভালো মন্দ সব ধরনের কর্মের জন্য প্রস্তুত। পিতা-মাতা, ভাই-বোন সকলকেই সে তার প্রীতি বা সুখ উৎপাদনের যন্ত্র বলে মনে করে। সুখের ব্যাঘাত ঘটলেই সে ক্রুদ্ধ হয়। জীবনের প্রথমে তাদের ন্যায়-অন্যায় বোধ থাকে না বলে নিজ সুখের জন্য এমন অনেক কিছু সে কামনা করে যা ন্যায় সঙ্গত নয়। কিন্তু একটু একটু করে বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে উপলব্ধি করতে পারে বড়োরা তার অনেক কামনা বাসনা পছন্দ করছে না, কিছু কিছু কামনা বাসনা পূরণের জন্য তাকে শাস্তি পেতে হচ্ছে, শাস্তির ভয়ে শিশুর মনে অবদমন প্রক্রিয়া শুরু হয়। পিতা-মাতা, শিক্ষক, পরিবার, সমাজ প্রভৃতি শাসকদের নৈতিক মানদন্ডে শিশুর যে ইচ্ছাগুলি প্রত্যাখ্যাত হয়, সে সেগুলি অবদমন করে। আর তার ঐ অবদমিত কামনা বাসনাগুলি তখন মনের সচেতন স্তর থেকে বহিষ্কৃত হয়ে নির্জ্ঞানে আশ্রয় নেয় "শিক্ষা শাসন প্রভৃতির ফলে শিশুর সহজাত কামপ্রবৃত্তি অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে তৎসংক্রান্ত অসামাজিক ভাবগুলি মনের গভীর স্তরে চলিয়া যায়। শিশুর অসামাজিক কামবৃত্তিগুলি কখনোই একেবারে নষ্ট হয় না; নির্বাসিত হইয়া রুদ্ধাবস্থায় তাহারা অজ্ঞাত মনে থাকিয়া যায়। এই রুদ্ধ প্রবৃত্তি হইতেই পরবর্তীকালে মানসিক রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।""[২]

জৈবিক প্রবৃত্তি, অবদমিত অসামাজিক নগ্ন কামনা-বাসনা ও প্রক্ষোভ প্রভৃতি মনের অচেতন বা নির্জ্ঞান (Unconscious) প্রদেশের অধিবাসী একথা আজ মনোবিজ্ঞানীদের সঙ্গে শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবিরাও স্বীকার করে নিয়েছেন। ফ্রয়েড বলেছিলেন যে, সহজাত কামনা-বাসনাগুলি জন্ম থেকেই অচেতনের অধিবাসী। তারা সরাসরি চেতন স্তরে উঠে আসে না ঠিকই, তবে অচেতনে থেকেই সচেতন আচরণকে প্রভাবিত করে। ফ্রয়েড অচেতন ও চেতন মনের নাম পরবর্তীকালে পরিবর্তন করে অদস্ বা ইদ্ (id) এবং অহম্ বা ইগো (ego) রেখেছিলেন।

ফ্রয়েডীয় মনস্তত্বে ইদ্ (id) বা নির্জ্ঞান মন হল, মানুষের আদিম যুগের যুক্তিহীন, দুর্জ্ঞেয়, অপ্রতিরোধ্য সহজাত প্রবৃত্তি। ইদ্ (id) অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়নায় অবরুদ্ধ কামজ ইচ্ছাগুলিকে চেতন বা সজ্ঞানে পাঠাতে চায়। ইদ্ (id) অন্ধকার জগতের বাসিন্দা, বাহ্যপরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকায় তার কোন বাস্তববোধ (reality sense) থাকে না, সে পরিচালিত হয় সুখনীতি বা সুখসূত্রের (Pleasure Principle) দ্বারা। ইদ্ সব সময় চায়, জৈবিক চাহিদার

তাৎক্ষণিক পূরণ। বৈধ- অবৈধ, সময়-অসময় বিবেচনা ইদ্ বা অদসের জন্য নয়। ইদ্ বা অদস বন্য, বর্বর, বিশৃঙ্খল সব ধরনের নিয়মকানুনের বিরোধী, প্রবৃত্তির সেবাদাস।

সাধারণভাবে আমরা যাকে অহং বা চৈতন্য বলি ফ্রয়েডীয় মনস্তত্বে তাকেই বলা হয় ইগো (ego) বা চেতন মন (Consciousmind)। জন্মগ্রহণের পর প্রতিটি শিশুই হচ্ছে কতকগুলো সহজাত প্রবৃত্তির (Instincts) আধার। সে তখন ইদ্ বা অদসের দ্বারা পরিচালিত হয়। এরপর একটু একটু করে বড় হবার সাথে সাথে শিশুর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বেড়ে যায়। সে বুঝতে পারে কখন কোন প্রবৃত্তির দাবী মেটানো উচিৎ। বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, পরিবার, সমাজের দৃষ্টিতে কোন ধরনের প্রবৃত্তির দাবী চরিতার্থ করতে চাওয়া অন্যায়। এরপর সে সময় ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সজাগ হয় এবং তার গড়ে ওঠা মূল্যবোধ ও প্রতিকূল পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে জৈবিক ইচ্ছাগুলি পূরণ করতে চায়। প্রতিকূল অবস্থায় সে তার জৈবিক চাহিদা পূরণ বিলম্বিত করে, কখনো আবার তার ইচ্ছাকে অবদমিত করে। শিশু বা ব্যক্তির এই ধরনের বাস্তব সত্তাই হচ্ছে ইগো (ego) বা অহম্। অর্থাৎ ইগো বা অহম্ যে ধর্ম মেনে চলে তা হল বাস্তব নীতি (reality principle)। ইগো সহজাত প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করতে চায়, কিন্তু ভালো-মন্দ ইত্যাদি বিষয়ে তার দৃষ্টি সজাগ ঐ গুলির বিচার বিবেচনা করেই সে তার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবে।

ইদ, ইগোর আলোচনা প্রসঙ্গে এসে পড়ে সুপার ইগো (Super-ego বা অধিশাস্তার কথা। ফ্রয়েড সুপার ইগোকে 'Censorial guardian' বা 'অভিভাবক প্রহরী' বলে মনে করেন। সুপার ইগো বা অতি অহম্ এর ধর্ম হল 'আদর্শ' যা কিছু মহৎ বা নৈতিকতাপূর্ণ তাই করণীয়, অনৈতিক কর্ম সর্বদা পরিত্যাজ্য। এই জন্য সুপার ইগোকে ব্যক্তিত্বের নৈতিক হাতিয়ার (Moral arm of personality) বা 'অনমনীয় বিবেক' (uncompromising conscience) বলা হয়। সুপার ইগোর কাজ হল, " ইদ বা অদসের অন্ধ কিন্তু দুর্বার সহজ প্রবৃত্তিগুলিকে শাসন করা এবং অহম্ যদি কখনো ইদ্-এর দাবীকে মান্য করে নিরুদ্ধ ইচ্ছাকে চেতনায় স্থান দেয় তাহলে অহংকে কঠোর শাস্তি দেওয়া। কোন্ যৌনতৃষ্ণাটি (ব্যাপক অর্থে) চরিতার্থ করা যাবে, অহং-এর কোন্ দাবিটি বাস্তব পরিবেশ অনুসারে অনুমোদন যোগ্য হবে এই সবই নির্ধারণ করে অধিশাস্তা বা বিবেক।

ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন তত্ত্বাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল স্বপ্ন। স্বপ্ন সম্পর্কে ফ্রয়েডের তত্ত্ব প্রকাশিত হবার পূর্বে 'স্বপ্ন' বলতে সাধারণ মানুষ দৈবাদেশ বা ভাবী

মঙ্গল অমঙ্গলের ইঙ্গিতকেই বুঝতো। অনেকে মনে করত স্বপ্নে আত্মা দেহের বাইরে এসে বিচরণ করে। ফ্রয়েড স্বপ্ন নিয়ে দীর্ঘ অনুসন্ধান ও গবেষণার পর জানান যে, স্বপ্ন হল আমাদের অপূর্ণ ইচ্ছা ও বাসনার পরিপূরণ, মানুষের অচেতন বা নির্জ্ঞা মনের গোপন চিন্তাভাবনা স্বপ্নের মাধ্যমে চেতন মনে এসে পূর্ণতালাভের চেষ্টা করে। তিনি আরও বলেন যে, নির্জ্ঞান মনের কোনো অপূর্ণ ইচ্ছাই অবিকৃতভাবে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। যে সব অনৈতিক, অসামাজিক কামনা-বাসনা সমাজ শাসনের ভয়ে অবদমিত হয়, সেগুলিই সেন্সর (Censor) বা প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি এড়াবার জন্য ছন্মরূপে আত্মপ্রকাশ করে। চেতন রাজ্যে স্বপ্নের প্রকাশিত রূপকে ফ্রয়েড নাম দিয়েছেন 'Manifest dream content' বা স্বপ্নের প্রকাশিত রূপ। স্বপ্নের অন্তর্নিহিত রূপ হল নির্জ্ঞান মনের অবদমিত কামনা-বাসনা; ফ্রয়েড এই রূপের নাম দিয়েছেন 'Latent dream Content'। তিনি 'The Interpretation of Dreams' (১৯০০ খ্রিঃ) গ্রন্থে স্বপ্নের বিচিত্র ছদ্মবেশ বা সঙ্কেতের ব্যাখ্যা করেছেন।

ফ্রয়েডের 'Psycho-Pathology of Everyday life' (১৯০৪খ্রি.)গ্রন্থের সর্বরতিবাদ (Pansexuality) বা লিবিডো (Libido) সংক্রান্ত আলোচনা মানব আচরণের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এখানে ফ্রয়েড জীবনের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে লিবিডো-র কথা বলেছেন। লিবিডোকে তিনি যৌনপ্রবৃত্তি মূলক শক্তি বলেছেন। যৌনপ্রবৃত্তির অর্থকরণের ভিন্নতাই ফ্রয়েডের মূল্যায়নকে জটিল করে তুলেছে। অনেকের কাছে 'লিবিডো' সংকীর্ণ অর্থে যৌনতা বা যৌনকর্ম, অনেকে আবার যৌনতা ছাড়াও যেকোনো সুখানুভূতিকেই 'লিবিডো' র আলোচনায় প্রাধান্য দিয়েছেন। আমরা দ্বিতীয় মতটি অর্থাৎ বৃহৎ অর্থ ধরেই 'লিবিডো' শব্দটির প্রাসঙ্গিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবো।

লিবিডো (Libido) হল মানুষের যৌন প্রবৃত্তিমূলক সহজাত মানসশক্তি। ফ্রয়েড বলেছেন যে, এই লিবিডোর একমাত্র উদ্দেশ্য আত্মসুখ বা আত্মতৃপ্তি। লিবিডো যে শুধুমাত্র শৈশবের প্রেম-ভালবাসা ও যৌনতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এমনটি নয়। মানুষের প্রভুত্ব প্রিয়তা, কর্তৃত্বের ইচ্ছা ও দাসত্বের মধ্যেও থাকে একধরণের যৌনতার (আত্মসুখ বা Pleasure Principle) প্রকাশ। লিবিডো মানুষের জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুগামীরা মনে করেন যে, অধিকাংশ অস্বাভাবিক আচরণের মূলে থাকে কোনো অতৃপ্ত যৌন কামনা বৃহৎ অর্থে, শুধুমাত্র Sex নয়, যে কোনো সখানুভূতি। অবদমিত যৌন কামনার পরিতৃপ্তির প্রয়াসই মনোরোগের লক্ষণরূপে প্রকাশ পায়। সমাজ সভ্যতা বিরোধী

যে সব ইচ্ছা বাস্তবে পূর্ণ হয় না, সেই ইচ্ছাগুলিই বিকল্প আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তাই ফ্রয়েড যে কোনো মনোব্যাধিকেই যৌনধর্মী বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে শৈশবকালীন লিবিডোর সংবন্ধন (Fixation of libido) হল পরোক্ষ কারণ, আর যে আঘাত মূলক অভিজ্ঞতার জন্য লিবিডো বা যৌনমানসশক্তি শৈশবকালীন সংবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করে, সেটি হল মানসিক রোগের প্রত্যক্ষ কারণ।

ফ্রয়েড নির্জ্ঞান মনকে (Unconscious mind) কেবলমাত্র অবদমিত (repressed) কামনা বাসনার রাজ্য বলেই মনে করেননি। তিনি জানিয়েছেন, নানা প্রকার উদ্দেশ্য বা প্রেষণাও নির্জ্ঞান মনে জন্মলাভ করে। তবে নির্জ্ঞানের কোনো কামনা-বাসনাই সচেতন মনে অবিকৃত ভাবে প্রকাশিত হতে পারে না। ঐ স্তরের প্রেষণাগুলিও স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশিত না হয়ে বিকৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

"স্বপ্ন ছাড়াও ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি মানব জীবনের উচ্চতর আদর্শ বা মূল্যগুলির এবং নানা রোগ লক্ষণ বা উপসর্গের মধ্য দিয়াও নির্জ্ঞানের ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। স্বভাবী লোকের অবদমিত নির্জ্ঞান ইচ্ছা প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে সংজ্ঞান মনে আত্মপ্রকাশ করে।"[৩] এই তিনটি উপায় হল- ১. উদ্গতি (Sublimation) ২. অভিক্রান্তি (Displacement), ৩. প্রতিক্রিয়া গঠন বা বিপরীত গঠন (Reaction Formation), এছাড়া আরও বিভিন্নরূপে নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যের বিকৃত প্রকাশ ঘটতে পারে। প্রকাশের রূপগুলি হল ১. অভিক্ষেপ (Projection), ২. যুক্তাভ্যাস (Rationalization), ৩. ক্ষতিপূরণ (Compensation) ৪. মনঃসৃষ্টি (Phantasy), ৫. প্রত্যাবৃত্তি (Regression) ইত্যাদি।

উদ্গতির (Sublimation) ফলে ব্যক্তির অবরুদ্ধ বা নিষিদ্ধ ইচ্ছা তার অসামাজিক লক্ষ্য হতে সরে এসে কোনো কল্যাণমূলক কর্মের দিকে চালিত হয় এবং দেশ ও দশের মঙ্গলময় কর্মে নিয়োজিত হয়ে তৃপ্তি লাভ করে। উদ্গতির ফলেই শিল্প- সাহিত্য, ধর্ম-দর্শন, বিজ্ঞান সমাজ হিতৈষণা, দেশপ্রেম প্রভৃতি উচ্চতর আদর্শ গুলির বিকাশ ঘটে। আসল কথা, ব্যক্তির লিবিডো (Libido) যখন কোন ক্ষেত্রে অতৃপ্ত হয়, তখন সমাজ স্বীকৃত সম্মানজনক কোনো কাজের মাধ্যমে সে তৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে। লিবিডোর তৃপ্তিলাভের এই ধরনের প্রয়াসকে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের পরিভাষায় Sublimation বলা হয়। উদগতি বা Sublimation সজ্ঞান ইচ্ছার দ্বারা সাধিত হয় না। আমরা যখন কোনো মহিলাকে সেবাব্রতে আত্মোৎসর্গ করতে দেখি, তখন ধরে নিতে হবে, তাঁর অবদমিত মাতৃত্বের কামনাই তাকে ঐ কাজে উৎসাহিত করেছে।

নির্জ্ঞান ইচ্ছার অপর একটি প্রকাশ হল অভিক্রান্তি। এক্ষেত্রে অবদমিত ইচ্ছা উদগতির মতো কোনো কল্যাণকর পথে প্রবাহিত হয় না। এই পদ্ধতিতে এক উদ্দেশ্যের লক্ষ্যবস্তু অন্য কোন লক্ষবস্তুর দ্বারা প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়। যেমন কোনো মহিলার অবদমিত মাতৃত্ব-কামনা কুকুর, বিড়াল, পাখি পোষার মধ্য দিয়ে বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়।

প্রতিক্রিয়া গঠন হল নির্জ্ঞান ইচ্ছা প্রকাশের এমন একটি উপায়, যেখানে মনের উদ্দেশ্য বিপরীত রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তাই সমাজে এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে, কোনো সাধু হঠাৎ চোরে পরিণত হচ্ছে, আবার কোনো দুর্বৃত্ত রাতারাতি সাধুতে পরিণত হয়েছে।

বিকৃত ইচ্ছার প্রকাশ অভিক্ষেপ বা Projection এর মাধ্যমেও রূপায়িত হয়ে থাকে। " ব্যক্তির নিজের মনের গহনে লুকিয়ে থাকা এবং নিজের কাছে অবাঞ্ছিত ধারণা আকাঙ্ক্ষা গূঢ়েয়া (Complex) প্রভৃতির চাপ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সেগুলি অপরের ঘাড়ে চালান করে দেওয়ার নির্জ্ঞান (Unconscious) প্রক্রিয়া'[৪] আমরা সমাজে তাই দেখতে পাই, যে সকল পুরুষ অন্য স্ত্রী লোকের প্রতি আসক্ত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারাই পতিব্রতা স্ত্রীর সতীত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে থাকে।

যুক্ত্যাভাস (Rationalization) হল এক ধরনের আত্মরক্ষার কৌশল। ভাবনাচিন্তা না করে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে কোনো কাজ করার পর ভেবে চিন্তে একটা উচ্চমার্গের যুক্তি খাড়া করার ঘটনা। বাবা হঠাৎ রেগে গিয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ছেলেকে মারলেন, পরে যুক্তি খাড়া করলেন তিনি ছেলের ভালোর জন্যই মেরেছেন। নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যকে ছদ্ম আবরণে প্রকাশের একটি পন্থা বা উপায় হল ক্ষতিপূরণ বা অনুপূরণ। ব্যক্তি নিজের কোনো ত্রুটি বা দুর্বলতা ঢাকার জন্য এমন কোনো গুণ কিংবাসমাজের চোখে প্রশংসার যোগ্য এমন কোনো কর্মদক্ষতাকে বাড়িয়ে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। এমন অনেক ছেলে মেয়ে আছে যারা নিজেদের নিজেরাই সুশ্রী বলে মনে করে না, তাই তাদের সৌন্দর্যের ক্ষতিপূরণের জন্য তারা পড়াশোনা, সাহিত্য সঙ্গীত, খেলাধূলা বা ব্যবসা বানিজ্যে অসম্ভব রকম দক্ষতার পরিচয় দিয়ে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। আবার দেখা যায়, নিরক্ষর পিতা পুত্র বা কন্যাকে উচ্চশিক্ষিত করে নিজের নিরক্ষরতার ক্ষতিপূরণ বা অতিপূরণ করেন।

মনঃসৃষ্টি বা (Phantasy) সুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার কৌশল (ego- defence Mechanism) হিসাবে দেখা দিতে পারে। এ হল এক ধরনের উদ্ভট কল্পনা যার মধ্য দিয়ে নির্জ্ঞান উদ্দেশ্য সজ্ঞান মনে প্রকাশিত হয়।

মনঃসৃষ্টির একটা স্তর পর্যন্ত ব্যক্তি তার কল্পিত বিষয়ের অবাস্তবতা সম্পর্কে মোটামুটিভাবে সচেতন থাকে। কিন্তু সে যখন তার নিজের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে উৎপন্ন উদ্ভট কল্পনাকে বাস্তব সত্য বলেই মনে করে তখন তা গুরুতর মানসিক রোগের (চিত্তভ্রংশী বাতুলতা বা Schizophrenia) লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হয়।

ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে Regression বা প্রত্যাবৃত্তি হল এক ধরনের পশ্চাদগমন বা পশ্চাদপসরণ। ব্যক্তির যৌনমানস-শক্তি (Libido)-র আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক সময় নানা কারণে বাধার সৃষ্টি হয়। এই বাধার জন্য লিবিডো যদি কোনো স্তরে অতৃপ্ত থেকে যায় অথবা ব্যক্তি যদি নিজেকে মানিয়ে নিতে না পারে তখন বয়সোপযোগী পর্যায় থেকে পূর্ববর্তী পর্যায়ে (সাধারণত শৈশবের যে পর্যায়ে সে আনন্দ পেয়েছিল) সে ফিরে যেতে চেষ্টা করে। তাই অনেক সময় আমরা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে শিশু বা কিশোর-সুলভ আচার আচরণ করতে দেখি।

অবদমন: মানব জীবনে জটিল সমস্যা সৃষ্টির মূলে অবদমিত কামনা বাসনা বা নির্জ্ঞান ইচ্ছা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফ্রয়েডের মতে, ইদ বা অদসের সুখসূত্র (Pleasure principle) এবং অহম্ (ego)-এর বাস্তবতা সূত্র (reality)- এর দ্বন্দ্বই অবদমনের মূল কারণ। সমাজ অস্বীকৃত কামনা-বাসনা, আবেগ ইত্যাদি চেতন বা সজ্ঞান (Conscious) মনের কাছে গ্রহণীয় না হলে, যে স্বতঃক্রিয় (automatic) প্রক্রিয়ায় তাদের নির্জ্ঞানের অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়, তাকেই অবদমন (repression) বলে।

উভাবেগ: ব্যক্তির দ্বৈত মানসিকতা বা উভাবেগ তার নিজস্ব এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ স্বজন পরিজনদের জীবনে জটিল সমস্যা-সংকটের সৃষ্টি করে। Ambivalence বলতে বোঝানো হয়, দোদুল্যমানতা, দ্বিমুখিনতা বা দোটানা। যুগপৎআকর্ষণ ও বিতৃষ্ণার মনোভাব। সুইস মনোবিজ্ঞানী ইউজেন ব্লয়েলার ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে সিজোফ্রেনিয়া রোগের ক্ষেত্রে এই কথাটি প্রয়োগ করেন। ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষার ক্ষেত্রে Ambivalence বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। একইভাবে বর্ধিত বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী ভাব বা আবেগের যুগপৎ অবস্থানকে Ambivalence বলে। একই ব্যক্তির মনে একই সঙ্গে ভালবাসা-ঘৃণা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, আকষর্ণ-বিতৃষ্ণা প্রভৃতি বিপরীতধর্মী মনোভাবের প্রকাশ ঘটলে তাকে আমরা বলবো উভাবেগ বা দ্বৈতমানসিকতা বা দোলাচলচিত্ততা। ব্যক্তির আচার আচরণের ঐ জাতীয় মনোভাবের প্রকাশ সাধারণ মানুষের কাছে রহস্যময় বলে মনে হয়। কিন্তু ব্যক্তির ঐ অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহারের মূলে কাজ করে নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়া। বিভিন্ন আবেগ ও ইচ্ছার দ্বন্দ্বময়

সংঘাতের ফলেই যে চারিত্রিক অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়, তা মনস্তাত্ত্বিকেরা জানেন। তাই তাঁদের কাছে ব্যক্তির গহন মনের খবর জানার জন্য দোলাচলচিত্ততার বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। নজরুল তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা 'পূজারিণী'-তে লিখেছেন –

"নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো,
এরা দেবী, এরা লোভী, যত পূজা পায় এরা চায় তত আরো!
ইহাদের অতিলোভী মন,
একজনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়,
যাচে বহুজন !"

– মনস্তত্ত্বের পরিভাষায় একে 'বহুবল্লভতার কামনা' বলা হয়।

শুধু নারী নয়, প্রত্যেক পুরুষের প্রবৃত্তির মধ্যেও এই আদিম প্রবণতা রয়েছে। শিক্ষা-সংস্কার মানুষের ঐ প্রবৃত্তি প্রকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বহুবল্লভতার কামনায় এক ধরণের শিশুসুলভ স্বার্থপরতাবোধ কাজ করে। বহুবল্লভতার কামনা (Polymorphous Perverse) হল এক ধরনের বিকৃত মানসিক প্রবণতা। শৈশব থেকেই মানুষ যৌনমানস-শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় – একথা আমরা জেনেছি। যখন কোনো বাইরের উদ্দীপক মানুষের প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে তখন মানুষের প্রেম-প্রবৃত্তি বিকৃতি লাভ করে বহুবল্লভতার কামনায় রূপান্তরিত হয়।
মানুষের আদিম কামনা-বাসনা,লোভ-লালসা আজ সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। তার সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দের বিচার বিশ্লেষণ মনস্তত্ত্বের নিরিখে করা হলেই ব্যক্তি মানুষের প্রকৃত স্বরূপ জানা সম্ভব হয়। মানুষের মধ্যে আত্মসুখ পরায়ণতা বা ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ করার বাসনা থাকবে – এটি মনস্তাত্ত্বিক-সত্য; কিন্তু একথাও সমানভাবে সত্য যে, মানুষ-ই পারে শিক্ষা-সংস্কৃতি, রুচিবোধ ও নিরন্তর প্রয়াসের দ্বারা তার মনকে সংযমের শাসনে নিয়ন্ত্রণ করে 'অচৈতন্যে'র অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে 'চৈতন্য' তথা আলোকের অভিমুখে অভিযাত্রা করতে।

তথ্যসূত্র :

১) মিশ্র পুষ্পা ও মিত্র মাধবেন্দ্র,সিগমুন্ড ফ্রয়েড মণঃসমীক্ষণের রূপরেখা, , নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, ৮ / ১ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা -০৯, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৪, পুণমুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০০৭ ।

২) বসু গিরীন্দ্রশেখর , স্বপ্ন,বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-০৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৫১, পঞ্চম মুদ্রণ আষাঢ় ১৪১৩।
৩) ভট্টাচার্য পরেশনাথ, মনোবিদ্যা, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, প্রথম সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৭০।
৪) মজুমদার ধ্রুবজ্যোতি,অস্বভাবী মনোবিদ্যা এবং মনোরোগবিদ্যার অভিধান, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট ১৯৯১।

ছাত্র-জীবনের উদ্দেশ্য শুধু পরীক্ষায় পাশ ও স্বর্ণপদক লাভ নহে – দেশসেবার জন্য প্রাণের সম্পদ ও যোগ্যতা অর্জন করা।

- সুভাষচন্দ্র বসু

আধুনিক সময়ে সংস্কৃত চর্চা ও রবীন্দ্রনাথ: একটি সমীক্ষা

ড. শেখ আসরফ আলী

সহ. অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

গভর্মেন্ট জেনারেল ডিগ্রী কলেজ কালনা-১

বঙ্গদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষায় সংস্কৃত চর্চার প্রচার প্রসারের ক্রমশ ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিভিন্ন সভা, সমিতি ও সেমিনারে তার কিছু প্রমাণ মেলে। ভালো হোক বা মন্দ হোক এইসব সংস্কৃত চর্চার ও সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার মূলে আছে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা। তিনি সংস্কৃত টোলের পন্ডিতগণের মতো সংস্কৃত সাহিত্য ব্যাখ্যার জন্য ভাষ্যকারের শরণাপন্ন হয়নি। একজন সংস্কৃত অনুরাগী শুধু নয় বিশেষ অনুরাগী, প্রকৃত পন্ডিতগণের মতোই মন দিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের বা কাব্যের তত্ত্ব আহরণ করেছেন এবং কবিত্ব ও সাহিত্যের দ্বারাই সেই তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করেছেন। তা না হলে অন্যান্য অনেক সংস্কৃত কাব্যের মতোই 'প্রাচীন সাহিত্য'-ও আমাদের কাছে অনধিগম্য থাকতো, শুধু তাই নয় রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনার মধ্যে কোথাও প্রত্যক্ষ কোথাও পরোক্ষভাবে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব পাওয়া যায়।

অনুবাদ সাহিত্য হিসাবে ধরতে গেলে অবশ্য বাংলায় বইয়ের অভাব নেই। কৃত্তিবাস বাল্মীকির মহাকাব্যের বিষয়বস্তু সম্যক রূপে জেনেও তাকে সেই রূপে প্রকাশ করেনি। করলে হয়তো আমাদের কাছে এত প্রিয় হতো না। আজ সংস্কৃতনভিজ্ঞ বা সংস্কৃত না জানা বাঙালি এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের কৃত্তিবাস ও তুলসী দাসের মধ্যস্থাতেই বাল্মীকিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে শিখিয়েছে। স্বয়ং বাল্মীকি এসে তাদের মধ্যে সরাসরি উপস্থিত হলে প্রত্যক্ষভাবে এই স্থান পেতেন কিনা তাতে সন্দেহ আছে। সেইরূপ রবীন্দ্রনাথের সাহায্যেই আমরা সংস্কৃত সাহিত্যের বহু কবিকে অল্প-বিস্তর জেনেছি। এই সংস্কৃত কবিগণকে চেনার জন্য রামায়ণের নীলকণ্ঠের 'মন্ত্ররামায়ণ' নাট্যভাষ্যকার রাঘব ভট্ট বা মল্লিনাথের টীকাই পর্যাপ্ত নয়।

এই আধুনিক সময়ের একটু পূর্বকালীন সময়ে আমরা দেখি উপনিবেশিক শিক্ষায় ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতির অনেক কিছুই আদান-প্রদান হল। ১৯৮৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোন্স প্রতিষ্ঠিত 'দি এশিয়াটিক সোসাইটি'তে সংস্কৃত ও ভারতবিদ্যার পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এই ভাষা-জ্ঞান ভারতের সাহিত্য-সংস্কৃতি দার্শনিক তত্ত্ব ও সামাজিক ঐতিহ্য অনুধাবনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করে। ফলে ভারতের সাহিত্য সংস্কৃতি, ধর্ম ও দর্শন ইত্যাদি গ্রন্থ ইউরোপীয়গণ তাঁদের ভাষায় অনুবাদ করেন। পরবর্তীকালে শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই ভারতবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন।

তিনি সংস্কৃত ভাষায় লেখা কয়েকটি গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে ১৯০৭ সালে 'প্রাচীন সাহিত্য' প্রবন্ধ রচনা করেন। এই 'প্রাচীন সাহিত্য' প্রবন্ধে, আদিকবি বাল্মীকি, মহাকবি কালিদাস ও সংস্কৃত গদ্য সম্রাট বানভট্টকে স্থান দিয়েছেন। এই প্রবন্ধে যে কাব্যগুলির সমালোচনা তিনি করেছেন সেগুলি হল— (১) রামায়ণ, (২) মেঘদূত (৩) কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা (৪) শকুন্তলা, (৫) কাদম্বরীচিত্র ও (৬) কাব্যের উপেক্ষিতা।

রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্যে'র মধ্য দিয়েই আদিকবি বাল্মীকি, মহাকবি কালিদাস ও গদ্যকাব্যকার বানভট্টের কাব্যরস আস্বাদন করতে পারা যায়। বিশেষত ভাবানুবাদের জন্য আমাদের অভ্যাসই যথেষ্ট কিন্তু রসানুবাদের জন্য অনুভূতির প্রয়োজন— এই ব্যাপারে এইখানেই রবীন্দ্রনাথ অনন্য রসিক কারণ আসল রসিক তাকেই বলা হয় যিনি নিজের রসের রসগ্রাহিতা দিয়ে রসের প্রদীপকে উস্কে দেন পাঠকের কাছে।

তাঁর রচনায় ভারতীয় সাহিত্য ও তার আলোচনা সমালোচনা বিভিন্ন ধারায় বয়ে চলেছে। ব্রাহ্মণ, সংহিতা মন্ত্র, উপনিষদ প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্য, বিভিন্ন স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্র, তন্ত্র, ইতিহাস পুরাণ, বিভিন্ন দর্শন শাস্ত্র সুভাষিতাদি উদ্ভট বচন প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্য তিনি লিখে গেছেন। এই লেখাগুলি কোন এক বিশেষ সময়ে লিখিত হয়নি। জীবনের বিবিধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগুলির প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতমূলক সকল রচনাই যে মূলানুগ বা বিতর্কহীন একথা সম্ভবত বলা যায় না। অলৌকিক প্রতিভাচ্ছটাতে কোন কোন স্থলে মূলের যথার্থ অর্থ এবং ভাব আচ্ছাদিত হয়ে অন্য রূপে অর্থ প্রকাশ পেয়েছে— এ রূপেও লক্ষ করা যায়। বহু প্রসঙ্গেই কবি সংস্কৃতানুবাদের পরিচয় ব্যক্ত রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতপ্রীতির উৎস সন্ধান এখানে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংস্কৃত ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বালক রবীন্দ্রনাথের উপনয়নের পূর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এর বন্ধু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'ব্রাহ্মধর্মে' সংকলিত উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ রীতিতে রবীন্দ্রনাথকে আবৃত্তি করাতেন। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি বলেছেন— "নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পর গায়ত্রী মন্ত্রটা জপ করবার দিকে খুব একটা ঝোক পড়িল, আমার বেশ মনে আছে, আমি 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম।" [জীবনস্মৃতি; পিতৃদেব]

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংস্কৃত শিখেছিলেন। মেঘোদয়ে তাঁর বড়দাদার 'মেঘদূত' আবৃত্তির সময় শুধু মন্দাক্রান্তা ছন্দের আহরণই রবীন্দ্রনাথের অন্তরকে নাড়া দিত। পরবর্তীকালে তিনি 'মানসী' কাব্যের 'মেঘদূত' কবিতা লিখেছেন— এখানে রবীন্দ্রনাথের মেঘদূতের সঙ্গে কবি কালিদাসের একটি নমুনার সাদৃশ্য তুলে ধরা হল—

"কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত! মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘনসংগীতমাঝে পুঞ্জীভূত করে।"

কবি কালিদাসের 'মেঘদূত'—

"কশ্চিৎ কান্তা বিরহগুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমাবর্ষভোগ্যেণ ভর্ত্তুঃ
যক্ষশ্চক্রেজনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু।" [পূর্বমেঘ-১; মেঘদূত]

'মেঘদূতে'র 'বিরহ'কে রবীন্দ্রনাথ এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেছেন। 'বিরহ' শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হল [বিরহ= বি-রহ + অল্] এখানে 'রহ'- ধাতুর অর্থ হল— ত্যাগ, বিচ্ছেদ, অভাব।

আমাদের মানব হৃদয়ে সর্বদা বিরহ, বিচ্ছেদ, অভাব, ত্যাগ চলছেই। সংস্কৃতজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ 'প্রাচীন সাহিত্যে'র 'মেঘদূত' প্রবন্ধে বলেছেন— "প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি সে আপনার মানসসরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোন পথ নাই।"

সংস্কৃতপ্রেমী সমালোচক রবীন্দ্রনাথ 'ত্রিবিধ বিরহে'র কথা বলেছেন— "বর্তমানের সঙ্গে অতীতের জীবনধারার বিচ্ছেদ, মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ ও একটি সর্বব্যাপী মানসলোক থেকে নির্বাসিত মানব আত্মার বিচ্ছেদ।"[ড.মুরারিমোহন সেন, সংস্কৃত সাহিত্য ভান্ডার, vol. II] 'প্রাচীন সাহিত্য' প্রবন্ধে কাদম্বরীর আলোচনায় একস্থানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সকলেই জানেন

ভাব সত্যের মতো কৃপণ নহে। সত্যের নিকট যে ছেলে কানা ভাবের নিকট তাহার পদ্মলোচন হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। ভাবের সেই রাজকীয় অজস্রতার উপযোগী ভাষা সংস্কৃত ভাষা।"

কবি সংস্কৃতকে বলেছেন— 'স্বভাব-বিপুল ভাষা'। তিনি আরও বলেছেন— "সংস্কৃত ভাষার স্বরবৈচিত্র, ধ্বনিগাম্ভীর্য, এমন স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে— তাহাকে নিপুণরূপে চালুনা করিতে পারিলে তাহাতে নানা যন্ত্রের এমন কনসার্ট বাজিয়া উঠে— তাহার অন্তর্নিহিত রাগিনীর এমন একটি অনির্বচনীয়তা আছে।" [সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ, সুখময় ভট্টাচার্য্য, পৃষ্ঠা ৫]।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সংস্কৃত কিরূপ প্রভাব সে সম্পর্কে সংস্কৃতানুরাগী রবীন্দ্রনাথের অভিমত সরাসরি তুলে দিলাম— "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি কাল থেকেই সংস্কৃত ভাষার প্রভাবান্বিত তাকে আয়ত্ত করতে না পারলে বাংলা ভাষার ছাত্রদের অধিকার সম্পূর্ণ হোতে পারবে না— এতে সন্দেহ নেই।" [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সংকলিত, কুরুপান্ডব গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে এই মন্তব্য দেখা যায়।]

সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন বিষয় থেকে বস্তু সংগ্রহ করে মাতৃভাষায় প্রবন্ধ রচনার জন্য ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীদের সমবেত আলোচনার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী সংসদ' নামে একটি পাক্ষিক সভা স্থাপন করেছিলেন।

অধ্যাপক ও সুলেখক প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, আশ্রমের সকল অধ্যাপক ও উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণকে অবশ্যই পাণিনি ব্যাকরণ পড়তে হত— রবীন্দ্রনাথ এমন নিয়ম চালু করেছিলেন পন্ডিত কোপিলেশ্বর মিশ্র মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে।

শান্তিনিকেতনের প্রাত্যহিক উপাসনা, সভা সমিতি এবং উৎসবাদির প্রারম্ভে বেদমন্ত্রের আবৃত্তি, উপনিষদের শ্রুতিগান প্রভৃতি সমবর্তনের দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে সংস্কৃত প্রেম। শান্তিনিকেতনের ফটক, ছাতিমতলা বহু জায়গায় উপনিষদ-এর শ্রুতি উৎকীর্ণ রয়েছে।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর, কলকাতা সংস্কৃত কলেজের এক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথকে 'কবি সার্বভৌম' উপাধি দেওয়া হয়। সেই অধিবেশনে কবি বলেছিলেন—

"যে শক্তি বাংলা ভাষার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, সে শক্তি সংস্কৃত ভাষারই উৎস থেকে পেয়েছে।" [সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ, সুখময় ভট্টাচার্য্য, পৃষ্ঠা ৮]

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্ট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিবর্গ শান্তিনিকেতনে এসে কবিকে ডি.লিট উপাধি দেন। সেই উপলক্ষ্যে কবি একটি সংস্কৃত ভাষায় ভাষণ রচনা করেন, তার প্রারম্ভটি ছিল– "ভবন্ত উক্ষতীর্থ বিদ্যালয়প্রতিভুব:। এষোহস্মি কশ্চিৎ কবির্ভারতষর্স্য।''

তিনি উপনিষাদাদির অংশবিশেষের দ্বারা তাঁর প্রবন্ধ ও কবিতার নামকরণও করেছেন। যথা– 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্', 'তত: কিম', 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধোদিবি তিষ্ঠত্যৈক:' ইত্যাদি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক সময়ে সংস্কৃতকে আবশ্যিক পাঠ্য রূপে স্থান না দেবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। কবি এর প্রবল প্রতিবাদ করে বলেছিলেন যে সংস্কৃত না জানলে বাংলা ভাষার জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্নী মৃণালিনী দেবীকে সংস্কৃত শেখাবার জন্য পন্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে শিক্ষক নিযুক্ত করেন। কবি পত্নী মহাভারত, মনুসংহিতা ও ঈশোপনিষদের কিছু কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন।

সংস্কৃত ভাষাকে শিক্ষার্থীগনের কাছে সহজ সরল ভাবে পৌঁছে দেবার জন্য তিনি 'সংস্কৃত শিক্ষা' নামক গ্রন্থ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করেন ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে।

নিজ কন্যাকে সংস্কৃত শেখাবার জন্য কঠিন অংশ ও বিস্তৃত বর্ণনা বাদ দিয়ে সরল শ্লোকগুলি সংগ্রহ করে পন্ডিত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের দ্বারা ‘সংক্ষিপ্ত বাল্মীকীয় রামায়ণম্’ সম্পাদনা করিয়েছিলেন।

এইভাবে তিনি নানা উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সংস্কৃত চর্চার পথ প্রশস্ত করেন।

কালপুরুষ

সুব্রত দাস
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ

একাশি হাজার নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে আমি ক্রমশ বুঝেছি মৃত্যুরহস্য
দেখেছি কালপুরুষের পায়ের নীচে কি বাধ্য এক শিকারী কুকুর ওৎ পেতে আছে
আমি তার নীল চোখের দিকে তাকিয়ে আমার শৈশবের পুকুরে তিনটি অবাধ্য ছোটমাছ খুঁজেছি
অথচ গ্যালাক্সির ব্যস্ত ট্যাক্সিতে চেপে আমি প্রতিদিন খুবলে খেয়েছি হৃদয়ের বিশুদ্ধ হরিণ
আর পুতুল পুতুল খেলার সংসারে তিন মুখ তিনদিকে ফেরানো .....
যেন এক প্রচণ্ড বৈদ্যুতিন সাপ আমাদের স্বর্গচ্যুত করছে বিষাক্ত নিঃশ্বাসে

আমি আপেলের দিকে তাকিয়ে বুঝে নিতে চাইছি নিউটন
আবেগ ও উষ্ণতার হৃদয়চিহ্নে সমস্ত পিছুটান ফিরে পেতে
সেই মৃত্যুগহ্বরের মুখে লকডাউনের নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছি

আমি ছুঁয়ে দেখবো কচিকলাপাতা ..... আমার বৃদ্ধ বাবার তুলোট আঙুল
আমি মায়ের পায়ের কাছে বসে চাল থেকে যত্ন করে বেছে দেবো আলতো কাঁকড়
আমি আজ সবকিছু ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে বলতে চাই

মৃত্যু যতই চোখ রাঙাক, আজ আমি জীবনের কাছে নতজানু

স্থিরচিত্র : ‘এ লেন টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ মিস্ট্রি’

স্থিরচিত্র : ‘এ ভিউ অফ ডাউকি রিভার অনলুকিং বাংলাদেশ’

চিত্র গ্রাহক : ড.তন্ময় দাস, সহকারী অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ

গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, কালনা-১ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা

চৈতন্য যাত্রা

প্রথম প্রকাশ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

পত্রিকা উপসমিতি :

মুখ্য পৃষ্ঠপোষক :

প্রফেসার (ড.) কৃষ্ণেন্দু দত্ত, অধ্যক্ষ, গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, কালনা-১

আহ্বায়ক সম্পাদক :

ড. বিদ্যুৎকুমার দাস, সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ

পত্রিকা উপসমিতির সদস্য :

ড. শেখ আসরাফ আলী, সহ. অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

ড. সুব্রত দাস, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

শ্রী শেখ ইমরান পারভেজ, সহ. অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ

গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, কালনা-১

মুড়াগাছা, মেদগাছি

পূর্ব বর্ধমান